ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 929-936
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.086

হারাধন বৈরাগীর কাব্য ভাবনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান

অমর্ত্য দাস, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি মহাবিদ্যালয়, পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tripura is a small state in Northeast India. This state of Tripura is at par with other states of India today in the race to be appointed to the best seat. However, in terms of linguistic diversity and natural beauty, Tripura is one of the states in the entire North Eastern region. Here the people of both hilly Bengali communities have been living together for years with the promise to stand by each other in happiness and sorrow. Haradhan Bairagi a permanent resident of Kanchanpur sub-division, a remote sub-division of North Tripura district of this Tripura state, is an associated name in the history of Bengali literature of Tripura. Although a forest-loving literary servant, he travelled all his life in the mountains and forests of the remote areas of Tripura, collected the spoken language of the people of each region, their food system, above all the enchanting natural beauty of the hills and forests of Tripura. This research essay attempts to discuss how Haradhan Bairagi wrote the mesmerizing beautiful environment of Tripura, a small hill state full of nature love and natural beauty, and how his writings have been absorbed by the readers. The way in which Haradhan Bairagi devoted himself to literary pursuits is truly undeniable. Haradhan Bairagi is a perfect example of how the attraction of mountains and jungles can make a common man to pursue literary pursuits.

***Key word**: Tripura, Haradhan Bairagi, Hasmati, Beauty of Nature, Hills, Jungle, Saima River, Jagabandhu, Dhalai*

সাহিত্য বরাবরই প্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্যায়ন, সমাজ এবং রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সমাজকে ছেড়ে যেমন সাহিত্য রচনা প্রায় অসম্ভব, তেমনি প্রকৃতিকে ছেড়েও সাহিত্য অনেকটা দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সমান। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য এই ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এক অন্যতম নব্য সংযোজিত নাম হল হারাধন বৈরাগী। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি জনজাতি মানুষদের ভাষার কথ্য ও শুদ্ধ রূপ সচেতন ও অচেতনভাবে ঢুকে গেছে। বাংলা ভাষারও কয়েকটি শব্দ এড়ানো যায়নি তার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। জঙ্গলপ্রেমী এই সাহিত্যিক চাকুরীজীবী হলেও গোটা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ে জঙ্গলে, আহরণ করেছেন প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা, তাদের খাদ্য প্রণালী, সর্বোপরি আহার ও জঙ্গলের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তবে এখানে একটি কথা বলে না রাখলে পাঠক মহল এবং লেখক উভয়ের প্রতিই একটি অন্যায় হয়ে যায় বলে আমার মনে হয়। কেননা আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধে যে সাহিত্যিক হারাধন বৈরাগীকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেই হারাধন বৈরাগী নামটি লেখক ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বলে রাখা প্রয়োজন যে আমরা যে সাহিত্যিক তথা সৃজনশীল কাব্য লেখক হারাধন বৈরাগীকে নিয়ে আলোচনা করছি সেই নামটি লেখকের ছদ্মনাম। সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে কবিতা লেখায় হারাধন বৈরাগীর হাতেখড়ি। কলেজে পড়াকালীন

'ত্রিপুরা দর্পণে' তিনি ছিলেন নিয়মিত একজন কবিতা লেখক। পরে চাকুরীতে প্রবেশের পর দীর্ঘদিন তিনি লেখালেখিতে অনিয়মিত হয়ে পড়েন। যখন ধলাই জেলায় তিনি বদলি হয়ে চলে যান তখন তিনি নতুন করে আবার কবিতা লেখা শুরু করেন এবং এখান থেকে তিনি তার হারিয়ে যাওয়া জীবনকে নতুন করে দেখতে পান। এখানে এসেই হারাধন বৈরাগীর প্রথম মুখবই প্রকাশ পায়। শুরু হয় নানা কবিতা ও গদ্য লেখা।

হারাধন বৈরাগীর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল 'হাসমতি ত্রিপুরা'। গ্রন্থের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ২০১৫ সালের জুন থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এছাড়াও হারাধন বৈরাগীর অন্যান্য কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'হৃদি চংপ্রেঙ', 'খুমপুইপাড়ায়'। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সাবলীলভাবে ভাব, ভাষা ও ছন্দ রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাছাড়াও তার কবিতাগুলির মধ্যে প্রেম, প্রকৃতি ও সমাজের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। তিনি বাস্তব জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যে অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তা নিয়েই তার এই সাহিত্য রচনাকর্ম। প্রাকৃতিক মনমুগ্ধকর সৌন্দর্যের সাথে কবির প্রেম ভাবনা কিভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় তার প্রতিটি লেখনীর প্রতিটি শব্দে।

হারাধন বৈরাগীর সৃষ্ট কবিতাগুলিতে ত্রিপুরার মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হাতছানি দিয়েছে বারবার। হাতছানি দিয়েছে তার কবিতায় ত্রিপুরার একের পর এক নদী। ত্রিপুরার জনজীবনের অন্তরালে প্রকৃতি খুব সহজেই মিশে যায়। ট্রেনের জানালার পাশে বসে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যায়নি এমন যাত্রী হয়তো খুব কমই আছে। তাই কবিরাও সেই হাতছানিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। ত্রিপুরার এই মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পটভূমিতে রেখে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে রচিত হয়েছে একের পর এক কবিতা। হারাধন বৈরাগীও হলেন এই ধারারই এক অন্যতম কবি লেখক। তিনিও লিখে গেছেন প্রকৃতি ও পাহাড়কে কেন্দ্র করে অজস্র কবিতা। তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের সংগ্রাম লড়াই এবং খাদ্য ও পোষাককে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'র সমস্ত কবিতায় তিনি এক ভিন্ন সুর দিয়ে কবিতাগুলো রচনা করেছেন। 'খুমপুইপাড়ায়' হল তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতেই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের এক অসাধারণ সমন্বয় দেখিয়েছেন। গ্রন্থের কবিতাগুলোতে পাওয়া যায় প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমাজের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধনটিতে হারাধন বৈরাগীর রচিত কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে কবির ভাবনার আলোকে ত্রিপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে স্বাধীন বিকাশ ঘটেছে সেই সম্পর্কে গবেষণামূলক এক আলোচনা প্রস্তুত করার প্রয়াস মাত্র।

'হাসমতি ত্রিপুরা': হারাধন বৈরাগী তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'য় রচিত কবিতাগুলির নাম উল্লেখ করেননি, অর্থাৎ তিনি কবিতাগুলির শিরোনাম দেননি। এখানে তিনি কবিতাগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। 'হাসমতি ত্রিপুরা'য় মোট ষাটটি কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা থেকে শেষ কবিতা পর্যন্ত তিনি কবিতাগুলোকে এক, দুই, তিন পর্যায়ক্রমে ক্রমাঙ্ক করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থের নামকরণে যে হাসমতি ত্রিপুরার কথা বলা হয়েছে সেই হাসমতি ত্রিপুরা কবির প্রেয়সীর নাম। গ্রন্থটির মধ্যে কবি অসাধারণ বাকশৈলীতে প্রেম ও প্রকৃতির নানা ছবি এঁকেছেন।

'এক' কবিতায় কবি আফিমের নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তার নেশায় এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছেন যে তিনি নিজেকেই আর দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কবি নিজেকে না দেখলেও তার অবিকল কাউকে দেখতে পারছেন—

> "ধর্ম নয় তার আফিমের নেশা
> আমি নই অবিকল আমার মতো।"[১]

প্রকৃতিপ্রেমী কবি হারাধন বৈরাগী প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাইমা নদীর তীরে হেঁটে যান। তিনি নিজেকে নদীর ভাঙ্গনের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন তার যখন নেশা ধরে যায় চাঁদকে তিনি তার কাছে চলে আসার জন্য ডাক দেন, কিন্তু চাঁদ আসেনা বরং চূড়া দুলিয়ে কোমর বেঁয়ে নেমে আসে নাবাল জমি। রাতের আঁধারে আকাশে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠা চাঁদ আর সাইমা নদীর তীরের ভাঙ্গনের অপূর্ব এক ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্য কবি হারাধন বৈরাগীর লেখায় রূপকতা ও সৌন্দর্যতার ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে। কবি বলছেন–

"সাইমার তীর ধরে প্রতি সন্ধ্যায়
লাউপানি অন্ধকারে হেঁটে যাই"[২]

'পাঁচ' কবিতায় কবি রাতের সাইমা নদীর সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। নদীর এপার ওপার রাতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার তীর বরাবর শ্মশানবাড়ী জেগে উঠেছে এবং অস্তাচলের চাঁদ ভাঙছে নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আবার তিনি কবিতার মধ্যে নদীর পাড় ভেঙে ধ্বস নামার উল্লেখও করেছেন। বলছেন ধ্বস নেমে চুপি চুপি নদীকে লুকিয়ে ফেলছে। এক অসাধারণ অভিব্যক্তিতে কবি নদীর জল স্রোতে তার পাড় ভেঙ্গে তাকে লুকিয়ে ফেলার কথাকে তুলে ধরেছেন।

"চিতায় উঠেছে মেসেন্তির বিগত ঐশ্বর্য
ধুপধাপ ধ্বস নামছে
চুপি চুপি লুকিয়ে ফেলছে নদী।"[৩]

কবির চাকুরীস্থল অর্থাৎ তিনি যে জগবন্ধুপাড়ায় চাকুরী করতেন সেই জগবন্ধুপাড়ার রাতের রহস্যের কথা উঠে এসেছে একটি কবিতায়। সেখানে দেখা যায় কবি জানালা থেকে উঁকি দিয়ে বুঝতে পারেননা কোন যুবক কোন যুবতীর কাছে যায়, কোন যুবতী কোন যুবকের অপেক্ষায়। তিনি যেখানে যান অবিকল একই কথা শুনতে পান। এখানে কবি জগবন্ধু পাড়ার রাতের এক রহস্যময় কাহিনির উল্লেখ করতে গিয়েও যেন কথা বলতে পারেননি। তবে কবিতার লাইনগুলো থেকে অবশ্যই এ কথা বুঝা যায় যে জগবন্ধুপাড়ায় রাতের অন্ধকারে এক যুবক আরেক যুবতীর কাছে কিংবা এক যুবতী আরেক যুবকের কাছে চলে যায়। তাই কবি বলছেন জগবন্ধুপাড়ায় যখনই রাত নেমে আসে তখনই এক রহস্যের মোড়কে ঢেকে যায় সেই পাড়া-

"রাত নেমে এলে জগবন্ধুপাড়া
রহস্য মোড়কে ঢেকে যায়।
ব্যারাকের জানালা থেকে বুঝা যায় না।"[৪]

লেখক হারাধন বৈরাগী রাতের জগবন্ধুপাড়াকে বলেছেন বর্ণচোরা, অবয়বহীনা। তিনি যখন চারপাশে তাকান কিছুই দেখতে পান না তার কাছে সবকিছুই রহস্যের মতো মনে হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারছেন না রাতের বর্ণচোরা রং পাল্টায় নাকি অবয়ব রং পাল্টায়। কবিপ্রিয়া হাসমতিকে জগবন্ধু পাড়ার রাতের রহস্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার কাছে বলছেন —

"হাসমতি, আমি এক প্রান্তিক
"জুয়াড়ি, বাঁশের ভেলায়।"[৫]

'আট' কবিতায় লেখক প্রকৃতিকে পরম প্রকৃতি বলেছেন, তাকে নিয়েই কবির সকল কবিতা রচনা। চিত্রা ছড়ার জলে আজ প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরার স্নান দেখে কবির সাইমা নদীর জলে ধর্মবোনের স্নানের কথা মনে জেগে উঠেছে। এটি যেন তার প্রেমেরই এক ব্যাঞ্জনাময় কবিতা—

"পরমা প্রকৃতি,
তোমাকে নিয়েই আজকের কবিতা।
চিত্রা ছড়ার জলে উদোম
স্নান করে হাসমতি ত্রিপুরা"[৬]

হারাধন বৈরাগী স্বভাবতই একজন প্রকৃতিপ্রেমী লেখক। তার প্রত্যেক লেখনীর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে প্রেমের বার্তা। 'নয়' কবিতায় লেখক দশ দিগন্ত ঘুরে আসার কথা বলেছেন। তিনি দিগন্তের দশ দিক ঘুরে সেই হাসমতি'র কাছে এসেই থমকে দাঁড়ান। কিন্তু হাসমতি কবির কাছে চিষ্কারা রাত্রির মতো, হাসমতি কবির কাছে নিস্তব্ধ সুন্দিবন। ফলে স্বভাবতই এখানে লক্ষ্য করা যায় যে কবির প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরার মধ্যেই কবি প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য এবং মেলবন্ধন গড়ে তুলেছেন —

"চিষ্কারা রাত্রির মতো

তুমি, অধরাই রয়ে গেছো
হাসমতি, নিস্তব্ধ সুন্দিবন।"[৭]

জগবন্ধুপাড়া কবির কাছে রহস্যময়ী। কবি নতুন চাকুরি পেয়ে জগবন্ধুপাড়ায় বদলি হয়ে গেলে চারদিকের পরিবেশ মানুষজন সবকিছুই কবির কাছে নতুন তবুও সেই জগবন্ধু পাড়ার প্রকৃতির গন্ধ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কাছে এই জগবন্ধু পাড়া এক স্বপ্নের মতো রহস্যে ঘেরা। কবি মনে করেন জগবন্ধু পাড়া রহস্যময়ী বলেই এখানে রাতের আকাশ থেকে ঝরে পড়ে রুপোর বরণ। এখানে কোন মানুষ থাকে না, শীতঘুমে চলে গেছে শ্বাপদেরা, কিন্তু সাইমা নদী গিরগিটির মতো পাহাড়ের খাদ বেয়ে চলেছে—

"রাত্রির নাম রহস্যময়ী বলে
থেকে ঝরে পড়ে রুপোর বরণ
কোন মানুষ নেই এখানে
শ্বাপদেরা চলে গেছে সব শীত ঘুমে"[৮]

তবে কবি জানেন এই জগবন্ধু পাড়ায় যদি কেউ এসে রাতের ঘ্রাণ নিতে পারে তবে সে বিদূষক হয়ে যেতে পারে। কবির মতে জগবন্ধু পাড়া যে রহস্যের মোড়কে ঢাকা আছে তাতে যে কেউ সেই রহস্যের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

'পনেরো' কবিতায় কবি রাতের আঁধারে জম্পুই পাহাড়ের একটি কমলা গাছের নীল হয়ে জ্বলার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই কমলা গাছকে তিনি বিষফলা বলে উল্লেখ করেছেন। বুনোফুল মেঘের মতো মন আনচান করে ওঠে, তিনি হাসমতিকে ঘিরে বাতাসে ফিসফাস গুঞ্জন আওয়াজ শুনতে পান। জম্পুই পাহাড়ে লেখক যেন এক অদৃশ্য ছায়ার অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই বলছেন—

"হাসমতি তোমাকে ঘিরেই____
ফিশফাস গুঞ্জন বাতাসে বাতাসে।"[৯]

রাতের মায়ার চাঁদ যখন জঙ্গলের রেঞ্জে নেমে আসে কবির চোখ বেয়ে নামে তখন রাতের কুহক। রাইমা নদী কবির কাছে হয়ে ওঠে ত্রিপুরার স্বাদের জামার বোতামের মতো। 'একত্রিশ' কবিতায় আবার দেখা যায় কবির প্রেয়সী হাসমতিকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কবি তাকে খুঁজছেন পুরাণের চারণের গানে, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের উত্থান পতনে, জুমের বনে, মাদল চংপ্রেঙ সুমুর মূর্ছনায়। আবার কখনো কবি তাকে খুঁজেছেন খেরেংবার অর্থাৎ দোলনচাঁপা ফুলের রূপের মধ্যে। পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় পোশাক রিয়া এবং পাছাড়ার নকশায় এবং জনজাতিদের সংস্কৃতির অন্যতম ধারা হজাগিরি ও গড়িয়া নৃত্যের হিল্লোলে আবার কখনো বিড়িপাতা ছড়ায় কবি নিজের মধ্যেই তার প্রেয়সী হাসমতিকে খুঁজেছেন।

"তোমাকে খুঁজি গোদক লাইরুপাতায় মামিরাও গন্ধে
তোমাকে খুঁজি খুম্পুই কুতুইমণিরাগ খেরেংবার-রুপে"[১০]

প্রকৃতির প্রেমে জঙ্গলের মাদকতায় কবি যেভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন তার উৎস কবির প্রাণের প্রিয় সেই জগবন্ধু পাড়া। কিন্তু 'ছেচল্লিশ' কবিতার শুরুতেই কবির কণ্ঠে শোনা যায় যেন এক হৃদয় কুণ্ঠিত শব্দ। কবিতার শুরুতেই তিনি এক ইতি টানার কথা বলেছেন —

"জগবন্ধুতেই ইতি হবে জানি
আমার সমস্ত জঙ্গল কাহিনি।"[১১]

কবি অনুভব করতে পারছেন যে এই জগবন্ধু পাড়াতেই তার সমস্ত জঙ্গলের কাহিনী শেষ হবে। সাইমার জলে তিনি যেভাবে নিজেকে পূর্ণরূপে খুঁজে পান সেই সাইমা নদীর পাড়ের ভাঙ্গা খাদে তিনি বারবার পিছলে পড়ে যান। লেখক ভয় পান, তার সাজানো বোধের কাছে তিনি নিজেই হেরে যান। তাই হারিয়ে যেতে চান নিভৃতির সংগোপনে। তার মাথার পাখায় অর্থাৎ মাথার উপর কোন এক আত্মহননকারী মায়ামথ উড়াউড়ি করছে। তাই তিনি সব ভুলে মায়া ছেড়ে মুক্তি চান। কবির মতে কোন এক অতিবিপ্লবী আজও জানে না যে চক্ররথে অবোধ্য আজও অনন্ত।

"কোনো অতি বিপ্লবী আজও জানে না
সহসা চক্ররথে অবোধ্য অনন্তে"[১২]

কবিতার মধ্যে তিনি আবার জঙ্গলের এক দৃশ্যের কথাও তুলে ধরেছেন, যেখান থেকে অনুমান করা যায় পাহাড়েও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ থাকতো মানুষের ভয়ে, মানুষ দিশেহারা হয়ে খুঁজতো নতুন কোন গ্রাম। কবির কথায় সেই দৃশ্যই যেন ফুটে ওঠে। তবু তিনি আক্ষেপ করেছেন যে সেই ভয়াবহ দিনে তিনি কেন উপস্থিত হতে পারলেন না। কবি হারাধন বৈরাগী ছিলেন একজন ভ্রমণ প্রেমী মানুষ। তিনি সমগ্র ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম, শহর, পাহাড়, জঙ্গল চষে বেরিয়েছেন। ত্রিপুরার পাহাড় থেকে সমতল, শহর থেকে গ্রাম সবকিছুই তিনি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। তার সমগ্র কবিতায় উঠে এসেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন দৃশ্যের কথা। তিনি বাস্তব জগতে যা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাকেই তিনি তার লেখনীর আঙিনায় স্থান দিয়েছেন। কোন কাল্পনিক ঘটনা বা কাল্পনিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়কে তিনি কবিতার আঙিনায় আনেননি। ত্রিপুরার একমাত্র জলপ্রপাত ডুম্বুরের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ডুম্বুরের জল যেমন মানুষের তৃষ্ণা মেটায় তেমনি এই জলাশয় থেকে মানুষ বেঁচে থাকার উৎস খুঁজে পায়। ডুম্বুরের মৎস্য চাষের ফলে মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়, বেঁচে থাকে বহু মৎস্যজীবী পরিবার। ডুম্বুরের জলরাশি এতটাই স্বচ্ছ যে কবি জলের অতলে থাকা বৃক্ষদের দেখতে পান।

ত্রিপুরা একটি পাহাড়ি রাজ্য, তার চারদিক ঘেরা অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বত দিয়ে। কখনোবা রেল চলছে সমতলে আবার কখনো চলছে পাহাড়ের মাটি খোদাই করা সুরঙ্গ দিয়ে। প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য কবিকে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করছে। সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে রেল চলাচলকে খুবই সুন্দর উপমা দিয়েছেন লেখক হারাধন বৈরাগী। লেখক এর কাছে পাহাড়ের সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে যান্ত্রিক রেলের চলাচলকে বৃহৎ অজগরের মতো মনে হচ্ছে—

"মাঝেমধ্যে অজগরের মত পাহাড় ফোড়ে
বেরিয়ে যাচ্ছি।"[১৩]

রেলে যাত্রাপথে কবির মনে হচ্ছে যে রাস্তার দুপাশের জঙ্গল যেমন ঘুরছে কবিও তেমনি ঘুরছেন। কিন্তু এই যাত্রাপথে কবির কেবল মনে পড়ছে তার প্রেয়সী হাসমতির কথা। কবি হারাধন বৈরাগী তার 'হাসমতি ত্রিপুরা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাতে এভাবেই তার প্রিয়সী হাসমতিকে ঘিরে প্রেম ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক অপূর্ব বাক ভঙ্গিমায় সমস্ত কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

'খুমপুইপাড়ায়': হারাধন বৈরাগীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম হল 'খুমপুইপাড়ায়'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে ত্রিপুরার মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রকৃতি হাতছানি দিয়েছে বারবার। ত্রিপুরার এই মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পটভূমিতে রেখে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে রচিত হয়েছে একের পর এক কবিতা। তার সঙ্গে হারাধন বৈরাগী তার অনন্য সৃষ্টি নির্মাণে জুড়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের সংগ্রাম বেঁচে থাকার লড়াই এবং খাদ্য ও পোশাককে। তবে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে এক অসাধারণ সমন্বয় দেখিয়েছেন। গ্রন্থের কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় তার প্রেম ও প্রকৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তুমি ছারা' কবিতায় লেখক পাহাড়ি জনজাতিদের আরাধ্য দেবতা গড়িয়াকে স্মরণ করে তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবি বলছেন প্রভু গড়িয়াকে ছাড়া তার কোন উদ্ধার হবে না। কবির ধ্যানে জ্ঞানে প্রভু গড়িয়া সর্বদা জাগ্রত থাকেন। তাই কবি যেখানেই যান না কেন প্রভু গড়িয়া যেন তার হৃদয়ের অন্তস্থলে জেগে থাকেন। এখানে লেখকের ধর্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি তার যে বিশ্বাস তারই প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি ঈশ্বরের মাঝেই স্বর্গ, নরক, শ্মশান সবকিছুই দেখতে পান।

কবি প্রকৃতির প্রেমে নিজেকে এতটাই মিশিয়ে দিয়েছেন যে প্রকৃতির মাঝেই তিনি তার সকল শখ আহ্লাদ খুঁজে পান। মধুমাসে টংঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চাঁপা ফুলের গাছ আছে। কবি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখেন সেই গাছে বিভিন্ন পাখিরা উল্লাস করছে। কবি তাতে অত্যন্ত মুগ্ধতার ছোঁয়া পেয়েছেন।

"টংঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে
একটি ফুলবতি সামফারাই গাছ"[১৪]

'মধুমাস-২' কবিতায় কবির বিরহ কাতর যন্ত্রণা যেন ফুটে উঠেছে। কবি ছিলেন একজন জঙ্গলপ্রেমী মানুষ। স্বভাবতই জঙ্গলের বিনাশে কবি যে কষ্ট পাবেন না তা বলা যায় না। বসন্তে গাছের ছাল যখন উঠে যায় কিরাতের দল নামে জঙ্গলে। এর থেকে বোঝা যায় বনদস্যুদের দল যখন জঙ্গলের গাছ কেটে নিয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখে কবি আহত হন। প্রকৃতির সাথে অগাদ প্রেম না থাকলে এই অনুভূতি আসার কথা নয়। 'সাইমা' কবিতায় সাইমা নদীর প্রতি কবির প্রেম ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কাছে সাইমা নদী সারা বছরই বাসন্তী, তার শেষে উড়ে বেড়ায় বসন্ত—

"সারাবছরই তুমি বাসন্তী
শ্বাসে শ্বাসে উড়ে বসন্ত।"[১৫]

'প্রেম অমর প্রেম চিরন্তন' কালজয়ী এই সত্যটি কবি হারাধন বৈরাগীর কবিতায় যথার্থতা লাভ করেছে। কোন এক চিকলি অর্থাৎ যুবতী খুমপুই (চাঁপা ফুল) খুব ভালোবাসে তাই জুমঘরে বাস করা এক চিকলা (যুবক) তাকে ভালোবাসার প্রমান স্বরুপ তার খোঁপায় গুঁজে দেয় একগুচ্ছ চাঁপা ফুল। কিন্তু রাতে মধুপোকা এসে তার খোঁপায় হুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়। তার চোখের মনি নড়ছে কিন্তু চোখ নড়ছে না। কবি বুঝতে পারছেন না কিছুই। কবির কাছে প্রেম চিরন্তন সেই সত্যটিই যেন বারবার উঠে এসেছে। যুবতীর দেহে নানান অলংকার থাকে, তার গলায় ফুলের মালা আছে কিন্তু বিরহ কাতর যুবতী প্রেমের ব্যর্থতায় এগিয়ে যাচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পাশে বাজতে থাকে নানান বিরহ বাদ্যযন্ত্র।

কবিপ্রেয়সী হাসমতি এই প্রথম সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। কবির প্রেয়সী আজ আঘাতপ্রাপ্ত। জঙ্গলের পশু পাখিদের এই করুণ দৃশ্য দেখে বেদনাহত কবি তার কবিতার শীর্ষে প্রেয়সী হাসমতিকে রেখে 'হাসমতি তুমিও' কবিতাটি রচনা করেছেন।

"হাসমতি তাই তুমিও
ঘনঘন উঠে আসো - সংবাদ শিরোনামে।"[১৬]

পাহাড়প্রেমী ও জঙ্গলপ্রেমী কবি হারাধন বৈরাগীর জঙ্গলের প্রতি প্রেম আবারও প্রকাশ পায় 'ঘটনা দিগন্ত' কবিতায়। কবি পাহাড়কে একটি 'ঘটনা দিগন্ত' বলে মনে করেন। আর তিনি নিজে হলেন সেই দিগন্তের বনবাসী। প্রকৃতিপ্রেমী একজন কবি প্রকৃতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন এবং সেখান থেকে আহরণ করবেন তার সুস্নিগ্ধ সুহাস এটাই স্বাভাবিক।

পাহাড়ের স্থান কাল পরিবর্তন হয়ে যায়, কিন্তু সেই জঙ্গল কবিকে এক অমোঘ বাঁধনের ফাঁসে জড়িয়ে রেখেছে। মধ্যরাতে একটি বেভুল মধুপ কোথা থেকে এসে কবির বিছানা জুড়ে নিয়েছে কবি নিজেও জানেন না। কবির গালে দিয়েছে সে চুম্বন, কবি উপমা দিয়ে বলছেন—

"জুড়ে নিল বিছানা-এক বেভুল মধুপ
ফুটিয়ে দিল গালে-রাতকানা ফুল।"[১৭]

'কুথুইমণিরাগ' এক ধরনের বুনোফুল। এখানে আবার দেখা যায় কবির হৃদয় ভাবনা ব্যর্থতা স্পর্শ করেছে। রাতের অন্ধকারে তিনি যে ফুলকে সৌন্দর্যে ভরপুর ভেবেছিলেন, সারারাত যে ফুলের সুহাসে তিনি মত্ত ছিলেন ভোরের আলোয় তিনি দেখেন সেটি একটি বুনোনফুল মাত্র।

পাহাড়ের দিগন্ত ছোঁয়া সম্ভব নয়। পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদ আর খাদ থেকে চূড়ার সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। পাহাড়ে ভ্রমণকারী কবি হারাধন বৈরাগী 'আমার কোন নারী নেই' কবিতায় পাহাড়ের বৃত্তান্ত যেমন দিয়েছেন তেমনি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সার্বিক দিক তুলে ধরেছেন।

"আমার কোনো ঘর নেই নেই কোন ঘাট
কোনো নারী নেই নেই কোন খাট।"[১৮]

পাহাড়ের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি কতটা একাত্ম হলে একজন কবি কিভাবে তাকে বর্ণনা, ভাষা প্রভৃতির দ্বারা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন তা কবি হারাধন বৈরাগীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কবিতাটিতে তিনি একজন মানুষ

বা কবি হিসেবে নয়, তিনি নিজেকে পাহাড়ের সাথে একাকার করে কথাগুলো বলেছেন। এ কথা যেন কবির কথা নয়, কথা যেন সম্পূর্ণ এক পাহাড়ের।

কবির স্তরিভূত স্বপ্নগুলো বার বার উড়ে যায়, যেমন করে উড়ে বর্ণময় প্রজাতির দল। কবির মতে একটি নেশা কবিকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে তাই তিনি স্বপ্ন পূরণের ঠিকানায় পৌঁছাতে পারেন না। অন্যদিকে কবি তার প্রেয়সী হাসমতিকে ভুলতে পারেননা। তাকে তিনি সারাক্ষণ অনুভবে জাগিয়ে রাখেন। পাহাড়ে জঙ্গলের বাজারে গেলে কবি একই রূপ দেখতে পান, প্রতিটি মানুষের একই মুখ দেখতে পান। পাহাড় জুড়া গন্ধে তিনি হাসমতির গন্ধ পান। তিনি মনে করেন এই সব কিছুই হাসমতির ফেলে যাওয়া স্মৃতি।

"ফেলে যাওয়া একই গন্ধ
হাসমতি তোমারই যেন!"[১৯]

'তুমিই আমার' কবিতায় দেখা যায় কবি হাসমতিকে ছাড়তে নারাজ। হাসমতি কবিকে ছেড়ে যেতে চাইলেও কবি তাকে ছাড়ছেন না। হাসমতি কবির কাছে খাকচান অর্থাৎ পরম শান্তির জায়গা। তাই সব কিছু তছনছ হয়ে গেলেও কবির কাছে হাসমতি তার একান্তই আপন। তিনি বলছেন হাসমতিকে দেখে কেউ চিনতে না পারলেও তিনি তাকে ঠিক চিনতে পারবেন কেননা তিনি হাসমতির মধ্যে দিয়েই নিজেকে দেখতে পান। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তাই সবকিছু ছাড়তে পারবেন কিন্তু হাসমতিকে তিনি ছাড়তে পারবেন না।

"তুমিই আমার পিদিমবাতি
আমার খাকচান।"[২০]

'খুমপুইপাড়ায়' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা হলো 'হাত নাড়ছে'। এই কবিতায় এসে দেখা যায় সম্পূর্ণ আলাদা এবং পৃথক একটি দৃশ্য—

"বিদায় হাত নাড়ছে, চিকলির মতো
গাইরিঙের আঙ্গিনায়।"[২১]

তাহলে কি কবির প্রিয়তমা হাসমতির থেকে কবির সত্যিই বিদায় নেওয়ার পালা ? হাসমতি এবার বিদায় নিচ্ছে চিরতরে। জুমঘরের উঠোনে যুবতীর মতো হাত নাড়ছে যেন বিদায়। আফ্রিকার ব্রু জনজাতির সতীমারী (সারথী) যেভাবে আকাশগঙ্গায় মিশে গেছে কবি ভাবছেন হাসমতিও ঠিক সেইভাবে মিশে যাচ্ছে। কবির কাছে হাসমতির বিদায় হাত নাড়ছে। তিনি বুঝতে পারছেন হাসমতি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার থেকে বিদায় নিচ্ছে। কবি যেন বেদনাহত, মর্মাহত হয়েই কবিতাটি লিখেছেন।

"হাসমতি-তুমি কি মিশে যাচ্ছো
সারেথির মতো-আকাশগঙ্গায়!"[২২]

ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসের নব্য সংযোজিত লেখক হারাধন বৈরাগী, একাধারে যিনি কথাকার, গল্পকার, কবি তার লেখায় ত্রিপুরার পাহাড়, জঙ্গল, উপজাতি সমাজজীবন এবং প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরাকে যেভাবে কাব্যগ্রন্থগুলির সংকলিত কবিতাগুলিতে তুলে এনেছেন তা সত্যিই পাঠক মহলকে এক অন্যতম মাত্রায় পৌঁছে দেয়। হারাধন বৈরাগীর রচিত কবিতাগুলি পড়ে অনায়াসেই ত্রিপুরার পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে, ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলের বুনো গন্ধকে আপন চেতনায় আত্মস্থ করা যায়। সেই দিক দিয়ে বলাই যায় যে ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চায় হারাধন বৈরাগী এক অন্যতম কাব্যগ্রন্থ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রিপুরার প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং আহরণ করেছেন প্রত্যেকটি জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আঞ্চলিক ভাষা, সেখানকার খাদ্য তালিকা এবং সবার আগে যে কথা বলা উচিত সেটি হল তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তিনি যে বাস্তবতার শিকার হয়েছিলেন তাকে হুবহু কবিতাগুলির আঙ্গিনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেননা তার রচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারলে দেখা যায় যে তিনি কোথাও কল্পনায় বিভোর হয়ে কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেননি বরং নিজের চোখে দেখা এবং পাহাড় জঙ্গলের

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েই সাহিত্য সাধনার মতো কাজে মনোনিবেশ করেছেন। ফলে তার রচিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি শব্দই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি সমতলবাসী হলেও পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের মুখের কথাকে যেভাবে লেখনীতে রূপ দিয়েছেন তা এ যাবৎকালে ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্যতম নজির সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বৈরাগী, হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, হালাইমুড়া কুমারঘাট, ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা নং-৭
২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৭
৩) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১১
৪) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১২
৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১২
৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৪
৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৫
৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৬
৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ২১
১০) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৩৭
১১) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৫২
১২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৫২
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪
১৪) বৈরাগী, হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা নং- ১১
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৭
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ২০
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৪৩
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৪৪
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬১
২০) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৩
২১) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪
২২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪

গ্রন্থপঞ্জী:

১) বৈরাগী, হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, হালাইমুড়া কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২) বৈরাগী, হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮